উঁকি দেয় শৈশব...

ইচ্ছের ইশারায় রোগাপাতলা বইটা হেঁট হয়ে তুলে নিই কলেজ স্ট্রিট ফুটপাথ থেকে। ঝাপসা চোখে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা। সনাতন পাঠক হয়ে ফিরে যাই নানারঙা শৈশবে... লিখছেন **সুব্রত ঘোষ**

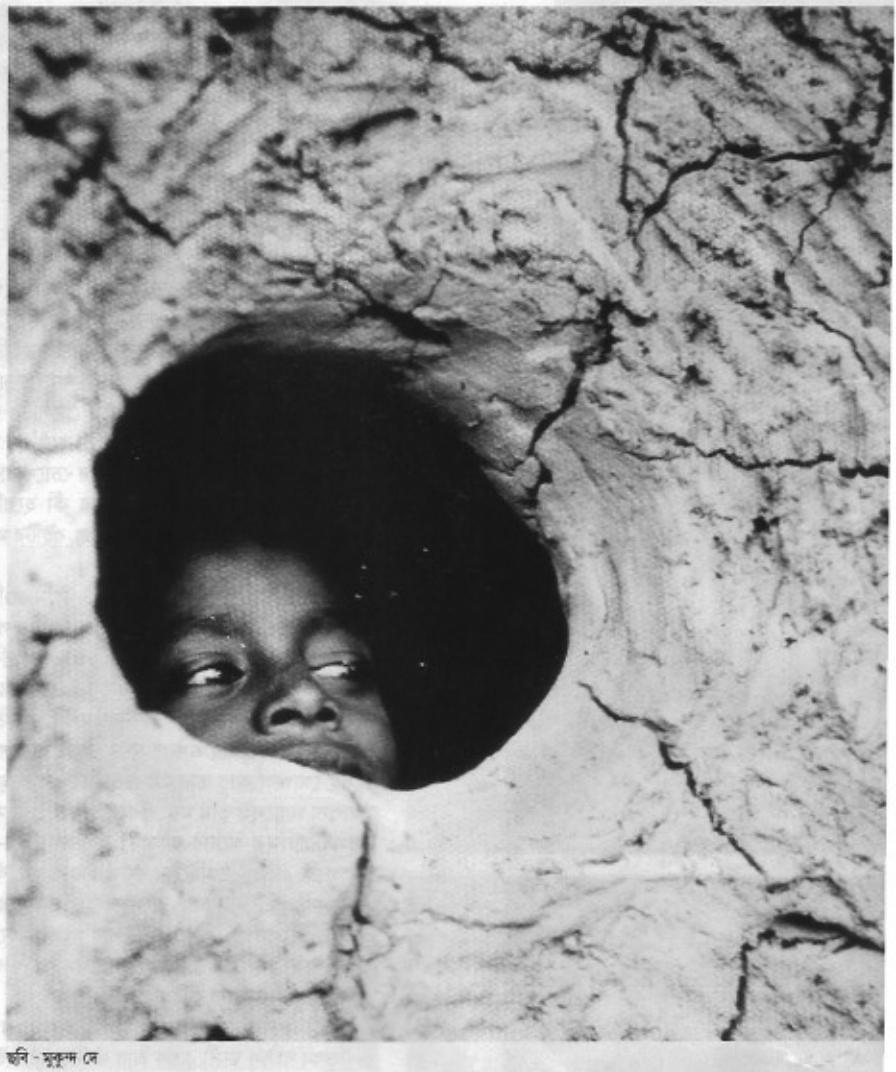

ছবি - মুকুন্দ দে

ওই! ঘন্টা বেজে গেল। বাড়িশুদ্ধু লোক ছুটছি। কাকা চাটাই পেতে এসেছে খানিক আগেই। সামনে গিয়ে বসতেই হবে মঞ্চের। 'দক্ষযজ্ঞ পালা' হবে প্রথমে। ক্লাবের ছেলেরা সারাদিন ধরে মাইকে চিৎকার করে করে বলেছে।

ঢং! — আলো নিভে গেল সব। শুরু হল বাজনা। বাবা বাদামের ঠোঙা এনে ধরিয়ে দিল হাতে। আলোর ঝকমকি শুরু হল। মা কালীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শুরু হল পালা। ও পাড়ার কার্তিককাকা শিব সেজেছে। মা-কাকিমারা কার্তিক কাকার বউকে কি একটা বলতে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ল। আর, কার্তিক কাকা কখন সত্যি শিব হয়ে উঠল চোখের সামনে, মনে নেই।

ইস্কুলে ভর্তি হয়েছি সবে। স্কুল-পালানো ছেলেদের ধরে আনতে গিয়ে মার খেয়ে স্কুলে ফিরি। সাঁওতাল পাড়ার পরবে সারাদিন নাচ দেখি, গান শুনি। ঘোষেদের বাড়ির কীর্তনের আসরে দুটি বাচ্চা ছেলে রাধা-কৃষ্ণ সেজে নাচে — দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ইলামপুর থেকে কাকিমার চণ্ডীদিদি বছর বছর আসতেন। সন্ধ্যেবেলা তাঁকে ঘিরে বাড়ির বাচ্চারা সবাই বসে পড়ি। পড়তে না বসলেও মা এখন বকবে না কিছুতেই। ঠাকুমার গল্পের ভূত-পেত্নী-দত্যি-দানো-রাজকুমার-রাজকুমারী-নাপিত-পাজি-ঠগ-চোর সবাই কোথা থেকে এসে ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়ে দুয়ারে, উঠোনে, বাড়ির পেছনের উত্তরের মাঠে, বাঁশবাগানে, পুকুরপাড়ে। উঃ! রাত্তিরে বাইরে একা একা যেতে ভয় করে। ভয় করে ঘর থেকে দু-পা দূরের রান্নাঘরে খেতে যেতে।

মঙ্গল-বৃহস্পতিবার ঠাকুর ঘরের সামনে থেকে নড়া যাবে না। মা কখন ওই লাল মলাটের বইখানা হাতে তুলে নেবে? কখন যে পড়তে শুরু করবে! মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা শুনলে কী হয় জানি না। জানিনা ইতু পুজোর ব্রতকথা শুনলেই বা পুণ্য কতখানি বাড়ে। শুধু জানি এই গল্পগুলো সাংঘাতিক। বারবার শুনেও পুরনো হয় না। শুনে শুনে মনে গেঁথে যায়। ইস্কুলে মাষ্টারমশাই গল্প বলতে বললে হুবহু বলে দিই। গোটা ইস্কুল, এমনকী হেডমাষ্টারও দাঁড়িয়ে শোনেন। মামারবাড়ি গেলে এই গল্পের টানেই ভাই-বোনেরা, মামা-মামীরা কাছছাড়া করে না কেউ।

প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পেরোতে না পেরোতেই পড়ার নেশা পেয়ে বসে। পরের ক্লাসের বাংলা বইগুলোও অনায়াসে পড়ে ফেলতে পারি। হাতে পাই দাদার গল্পের বই। মা পড়ে শুনিয়েছে সব। 'বাংলার লোককথা', 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ছোটদের আরব্যরজনী', 'পঞ্চতন্ত্র'। ছবিগুলো চিনতাম, এবার গল্পগুলোও পড়তে পারছি। কি মজা! যেখান থেকে খুশি পড়, যতবার খুশি। পড়ার বইয়ের ভিতর লুকিয়ে, খেতে খেতে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে, ঘুম থেকে উঠে...

মা আর দাদা তখন চিতাবাঘের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে রুদ্রপ্রয়াগ। দুজনেই সন্ধ্যা হলে আর বাইরে যেতে পারছে না। বাবার সাইকেলের ঘন্টি শুনে সেই বই চালান হয়ে যাচ্ছে বালিশের তলায়। আমি তখন হ্যারিকেনের আলোয় আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে গুহার দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি।

ক্লাস সিক্সে প্রথম বই কিনলুম মেলা দেখার পয়সায়। সে এক আশ্চর্য বই — পাতায় পাতায় ছবি! ছোটোদের রামায়ণ-মহাভারতের তুলনায় এই বইয়ের ছবিগুলোও আলাদা। শক্ত করে বাঁধানো, ঠিক 'আলোর ফুলকি'র মতো। লেখকের নাম উচ্চারণ করা যায় না সহজে। দাদা দেখে বলে, 'আরে বাঃ! — বুরাতিনোর কাণ্ডকারখানা!' উল্টে-পাল্টে বললে, 'ব্রতো সেই রাদুগার বই? তুই কোথায় পেলি?' তারপরেই, 'মা, সেই মিশুৎকার বইখানা কোথায় গেল?'

বাড়ির সব বই শেষ হয়ে গেল ক্লাস সিক্সেই। সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর, অবন ঠাকুর আরও কত কী! ছড়া ভালো লাগত সরল দে, কার্ত্তিক ঘোষ আর অন্নদাশংকর রায়ের।

বয়স বাড়ছিল। বাড়ছিল শরীর-মন। গল্পের

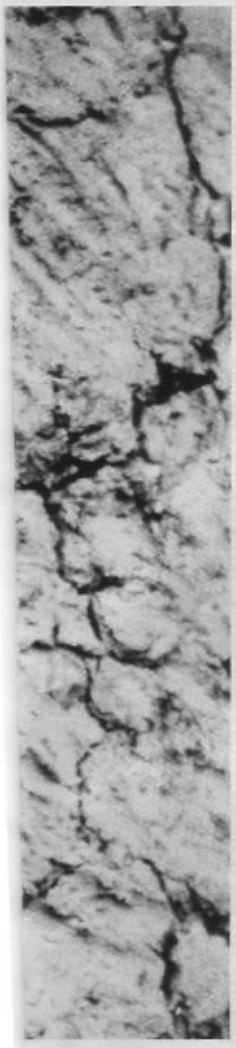

কি মজা! যেখান থেকে খুশি পড়, যতবার খুশি। পড়ার বইয়ের ভিতর লুকিয়ে, খেতে খেতে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে, ঘুম থেকে উঠে...

মেলা থেকে কিনে আনা 'বুরাতিনো' বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক! পঞ্চতন্ত্র, আরব্যরজনী গল্পের আঁতুড়ঘর। অতএব আবার ফিরে পড়তে হবে ছেলেবেলার বইগুলি। খোঁজ - খোঁজ - খোঁজ।

বইগুলোও বদলাতে থাকল। দাদার 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার ক্ষুদে বৈজ্ঞানিককে দারুন লাগে। আর ভালো লাগছে স্কুলের বন্ধুর নিয়ে আসা 'শুকতারা'র 'বাহাদুর বেড়াল', 'নন্টে-ফন্টে'। আর সেই বিখ্যাত বাঁটুল— 'বাঁটুল দি গ্রেট'।

রোগে ভুগি পালাজ্বরে প্যালারামের মতোই। চেহারাখানা খোলতাই। দুর্বলদের দলনেতা। কথাই আমার অস্ত্র। কেল্টুদাকে তাই মোটেই পছন্দ নয়। পছন্দ বাঁটুল। আনন্দমেলার দৌলতে টিনটিনের সঙ্গেও পরিচিত হলুম। কিন্তু তাতেও বাঁটুলের জনপ্রিয়তা কমল না।

বয়ঃসন্ধি পার হচ্ছিলুম। টেনিদা-ঘনাদা-খাজুদা-কাকাবাবু-পঞ্চপাণ্ডবে মন ভরছিল না। শ্রীকান্ত-অপু-লাবণ্যরাও সঙ্গে ঘোরে। চাঁদের পাহাড়-এর ভালোলাগা বদলে যায় আরণ্যকে। ইন্দ্রজাল কমিক্স ঠেলে সরিয়ে হাতে তুলে নিই শঙ্কুর ডায়েরি।

এরপরে তো জীবনের গল্পটাই বদলে গেল। বাংলা সাহিত্যে অনার্স পড়তে গেলুম কলেজে। সে এক অন্য জগৎ, লাইব্রেরিও বড়। দুদিন ক্লাস হতে না হতেই আবিষ্কার করলুম, মায়ের ব্রতকথা, ঘোষবাড়ির সংকীর্তন, মামার বাড়ির মনসা ভাসান গান, চণ্ডীদিদির গল্পগুলিই তো আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস! মেলা থেকে কিনে আনা 'বুরাতিনো' বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক! পঞ্চতন্ত্র, আরব্যরজনী গল্পের আঁতুড়ঘর!

অতএব আবার ফিরে পড়তে হবে ছেলেবেলার বইগুলি। খোঁজ - খোঁজ - খোঁজ। 'আরব্যরজনী', 'পঞ্চতন্ত্র' হারিয়ে গেছে। 'আলোর ফুলকি' উদ্ধার হল মামার বাড়ি থেকে। 'বুরাতিনো' বই চাপা পড়ে ছিল বাড়িতেই। খুঁজে পেলুম 'রাজকাহিনী', খগেন্দ্রনাথ, স্বপনবুড়ো, সুনির্মল বসু, লীলা মজুমদার। সুকুমার রায়ের সমগ্রটি ছোটবেলায় কী করে যে পড়তুম ভগবান জানে! এত ছোট হরফে ছোটদের বই ছেপেছে কোন পাবলিশার! সেদিন নতুন করে আবার আবিষ্কার করলুম 'বই'-কে। কে লেখে, কে ছবি আঁকে কে ছাপায়! কারা রাঙিয়ে দিয়েছে আমার ছেলেবেলাকে রঙে-লেখায়। তাদের নামই জানতুম না!

এবার সোজা কলেজস্ট্রীট। রাস্তায় রাস্তায় এত বই ঢালা! ইউনিভার্সিটির গেটে পৌঁছতে লেগে যায় একঘন্টা। বইয়ের পাহাড় ঠেলে খুঁজে পাচ্ছি ছেলেবেলার বইগুলি। সুখলতা রাও, মৌমাছি, শিব্রাম, হেমেন্দ্রকুমার রায়। পোকায় কাটা, বিবর্ণ, পাতা খসে যাচ্ছে। তবু সে যে আমার ছেলেবেলার সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে লেগে থাকা গন্ধ। আরব্যরজনী-র অন্তত শ-খানেক ভার্সন চোখে পড়ে এক বছরেই। 'বাংলার লোককথা' সেই অসাধারণ প্রচ্ছদ ছাড়াই বিকোচ্ছে ফুটপাথে, দোকানে। একটা বইও সেই ছেলেবেলার বইটি না। কোথায় সেই ছবি!

খুঁজে পেলুম রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবিতে বিবেকানন্দের জীবন। সেই টানা টানা চোখ। ইউরিদমিত্রিয়েভের 'ওরাও কথা বলে' — একেবারে যেমন পড়েছি তেমন।

রোজই হাঁটি ফুটপাথ ধরে। রোজই প্রশ্ন করি — 'ধলা কুকুর শ্যামলা কান' আছে? 'ছোট রাজকুমার'? 'হীরু ডাকাত'? 'শাদা ঘোড়া'? আচ্ছা, শৈলেন ঘোষের 'বাগডুম সিং'?

একদিন বইগুলির বর্ণনা দিতে একজন বলেন, "আপনি ওরিয়েন্টে যান। পঞ্চতন্ত্রটা ওখানেই পেয়ে যাবেন।" এবার চিনলুম প্রকাশকদের ঘর। দেবসাহিত্য কুটীর, নির্মল বুক এজেন্সি, দে'জ, আনন্দ। পঞ্চতন্ত্র দিয়ে শুরু, খুঁজে পেলুম শৈলেন ঘোষ। পদীপিসির বর্মীবাক্স, কার্তিক ঘোষের ছড়া, ছবিতে রামায়ণ, মহাভারত, টুনটুনির গল্প। সবই নতুন। ঝকঝক করছে।

পুরাতন-নতুন, ছেঁড়া-গোটা, নানাভাবে খুঁজে পাচ্ছিলাম হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলাকে। এমনি করতে করতে নতুন করে আবিষ্কার করলুম শিশুসাহিত্যকে। সহজপাঠের আঁকা ছবিগুলি কেন ফাঁকা-ফাঁকা, হাসি-খুশির ছবিগুলি ছবিকে বাদ দিয়ে নয়, বিদেশের বইগুলি কেন এখন আর পাওয়া যায় না — এইসব, আরও কত কী! খুঁজে পেলুম ওরামিও কিরাগোর 'অরণ্যকাহিনী'। এম.এ শেষ। বেকার সপ্তাহান্তে একদিন আসি কলেজস্ট্রীটে। ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করি। কফিহাউসে আড্ডার দলও ছোট হয়ে আসছে। এমনি এক ভিজে বর্ষার দিনে রাস্তার ধারে চোখে পড়ল বইটা। চেনা প্রচ্ছদ। কবে যেন দেখেছি কোন কালে! রোগাপাতলা বইটা হেঁট হয়ে তুলে নিই। হ্যাঁ সেই বইটাই তো কানাইলাল চক্রবর্তীর লেখা। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার। ব্যস্ত হাতে দোকানি পলিথিনে চাপা দিচ্ছে রাজ্যের বই। আর আমি শেষ পাতা উল্টেই বন্ধ করে দিচ্ছি। 'চলো দেখে আসি' - সব মনে পড়ে যাচ্ছে। দরদাম না করে টাকা মিটিয়ে ট্রাম লাইন টপকে স্টেশনের দিকে হাঁটছি। মনে পড়ছে, এই তো সেদিন, হ্যারিকেনের আলোয় মায়ের কাছে পড়তে বসেছি। মা বলছে আর আমি শুনে শুনে শ্লেটে লিখছি —

"একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না?
সে কি / এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি। / হঠাৎ মেঘ ডাকলো না? এখন তো মেঘ ডাকার /সময় নয়! চলো দেখে আসি। /"